উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যে শিক্ষাসংস্কার

ড. সৌমিত্র শেখর

বর্তমান পরিবর্তিত শিক্ষা নিয়মে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্ম উপযোগী শিক্ষিত মানবগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্য পরিদৃষ্ট হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পর আমরা যে বাংলাদেশ পাব তা হবে কর্মসংশ্লিষ্ট শিক্ষিত বাঙালির বাংলাদেশ, কর্মহীন বেকার বাঙালির বাংলাদেশ নয়

শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে সরকার। ইতোমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আর বড় কোনো পরীক্ষা থাকছে না। একাদশ শ্রেণিতে থাকবে একটি পরীক্ষা আর দ্বাদশ শ্রেণিতে আরেকটি পরীক্ষা। মোট কথা দশম শ্রেণির আগে আর অগ্নিপরীক্ষায় নামতে হবে না ছাত্রছাত্রীদের। এই সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উল্লাস লক্ষ করা গেছে। পরীক্ষা যে একটি ভীতি শুধু নয় তাদের কাছে নির্যাতন, এই উল্লাসের রকম দেখে ঠিকই বোঝা যায়। কোনো কোনো মা-বাবা এই সংবাদে অখুশি হলেও অধিকাংশ মা-বাবাই এতে খুবই খুশি। কারণ পরীক্ষার নামে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটর বা কোচিংয়ের পেছনে তাদের যেভাবে ছুটতে হয় এবং অর্থ ব্যয় করতে হয় তাতে মা-বাবাদের জন্যও এই সংবাদটি বেশ স্বস্তির। কিন্তু সরকার কি শুধুই ছাত্রছাত্রী ও তাদের মা-বাবার স্বস্তির জন্য এমন একটি বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? না, তা মোটেও নয়। সরকার অনেকদিন ধরেই এই পরিবর্তনের কথা ভাবছিল। বিশেষ করে ডা. দীপু মনি এমপি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নতুন ও জীবনমুখী শিক্ষা অভিযাত্রায় তিনি আমাদের ডাক দিয়েছেন। শিক্ষাকে কর্মমুখী করা এবং একই সঙ্গে তা নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করার ইচ্ছে তিনি তার বক্তৃতা-বিবৃতিতে নানা সময় প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের এত সংখ্যা দেখে নিশ্চয়ই আমরা নানা সময় নানা ধরনের প্রেসক্রিপশনের কথা শুনেছি। তাতে কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। তার কারণ হলো, বাস্তবতার সঙ্গে সেই প্রেসক্রিপশনগুলোর বেশ দূরত্ব ছিল। ডা. দীপু মনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষিত বেকার তৈরি না করে উচ্চশিক্ষাকে কর্মমুখী করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে দুটো বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার একটি হলো, প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা থেকে এর খোলনলচে বদল করা; অন্যটি হলো, উচ্চশিক্ষাকে সরাসরি কর্মের সঙ্গে যুক্ত করা। প্রথম কাজটি খুব সহজ ছিল না। কারণ এর সঙ্গে শুধুই তার মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা আছে তা নয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নামে যে আরেকটি মন্ত্রণালয় রয়েছে সেই মন্ত্রণালয় মূলত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষায় কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ, প্রশ্ন কাঠামো নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই এই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া পিইসিই নামের একটি পাবলিক পরীক্ষা তারা প্রবর্তন করে গত কয়েক বছর আগে থেকে পিতামাতাদের ঘুম কেড়ে নেয়। এই পাবলিক পরীক্ষাটি আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠে। দশ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষা দেবে বলে তাদের শৈশবকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান করে। আর এই সুযোগে শিক্ষাব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হয়। কোনো কোনো দৈনিক পত্রিকা শিক্ষাপাতায় এই পরীক্ষাকেন্দ্রিক নানা ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর ছাপিয়ে লাখ লাখ পরিমাণ সার্কুলেশন বাড়ায়, আয় করে কোটি কোটি টাকা। ফলে এই শিশুদের শৈশব জিম্মি করে নানাদিক থেকে শুধু ব্যবসা চলে এবং এই লাখ লাখ শিশু মূলত গ্রন্থ মুখস্থ করে করে একেবারে হয়ে ওঠে প্রাণশক্তিহীন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চেয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে আবার অনেকে সরাসরি রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছেন। কিন্তু এই পিইসিই পরীক্ষা উঠে যায়নি। এই পরীক্ষায় পাস করে শিশুদের কী এমন লাভ হয়েছিল? সে কথা আজ কেউ বলবে না। এই পরীক্ষার সার্টিফিকেট তাদের কোন কাজে লেগেছিল, সে কথাও কেউ তুলবে না। আসলে এগুলো তাদের জীবনে কোনো কাজে আসেনি। এর পর আরেক ফাঁস। অষ্টম শ্রেণিতে তাদের জন্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ জেএসসি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এটাও আরেকটি পাবলিক পরীক্ষা। পিইসিই পরীক্ষার মতোই এই জেএসসি পরীক্ষায় আমাদের কিশোর ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপকভাবে যুক্ত করা হয়। এতেও লাভ হয় মূলত শিক্ষাব্যবসায়ীদের। শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়া আর কোচিংয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে কিশোররা ছোটাছুটি করতে থাকে। মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের অবস্থা হয় ত্রাহি ত্রাহি। নির্দিষ্ট সময়ের পর জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরীক্ষা ও তার সার্টিফিকেট দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কী হয়েছে? কোনো কাজে লাগেনি এই সার্টিফিকেট। অথচ অষ্টম শ্রেণির এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের যে প্রস্তুতি এবং সময়, অর্থ, মনোযোগ ব্যয় হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখা এখানে কঠিন। এর চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার হলো, দুরন্ত কিশোরকালকে তারা শুধুই বইখাতা আর কোচিং সেন্টারের মধ্যে বেঁধে ফেলেছিল। পঞ্চম শ্রেণি আর অষ্টম শ্রেণির এই দুটো পাবলিক পরীক্ষা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কোনো কাজেই আসেনি। এই সার্টিফিকেট দ্রুত তাদের কোনো জায়গায় দেখাতে হয়নি। তা হলে এই পরীক্ষা দুটো কেন নেওয়া হয়েছিল? কাদের চিন্তার ফসল হিসেবে এই পরীক্ষা দুটোর জন্ম হয়েছিল? জিজ্ঞাসার কাঠগড়ায় তাদের দাঁড় করানো প্রয়োজন আছে। আনন্দমুখর শৈশব চাই সুখী সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে– এটা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তা হলে এই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা দুটো তুলে দিয়ে যথাযথ কাজই করা হয়েছে। বর্তমানে যে শিক্ষা অভিযাত্রা শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপির নেতৃত্বে শুরু হয়েছে সেটাই মূলত মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে শিক্ষা অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে মেলানো চলে।

মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু মূলত প্রাথমিক শিক্ষাকে আনন্দমুখী করে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষাকে কর্মমুখী শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার কথাও বলেছিলেন। বর্তমান সরকারের এই শিক্ষা অভিযাত্রায় আনন্দ ও কর্মমুখী এই প্রতীতি দুটোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সে কারণে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তার বিভিন্ন বক্তৃতায় উচ্চশিক্ষাকে কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নানা জায়গায় গুণগত উচ্চশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিমাণগত শিক্ষা থেকে সরে আসার কথা বলেছেন। বরং কম কিন্তু আরও ভালো– এই তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে ডা. দীপু মনির বক্তব্যে। তার বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন পরিমাণ নয়, গুণগত শিক্ষার দিকে ধাবিত হতে দেখা গেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোয় আগে যেখানে ছিল ঢিলেঢালা ভাব, সেখানে এখন কর্মমুখী শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্ধাতার আমলের বিষয়গুলোর বাইরে যুগোপযোগী বিষয়কে সমাদর করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং সমুদ্রবিষয়ক বিদ্যাচর্চার দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর এই যুগে উচ্চশিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না করতে পারলে খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। তবে শুধু এই বিষয়গুলোই নয়, একই সঙ্গে ব্রতচারীর মতো শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রতচারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। সম্পূর্ণ স্বাদেশিক চিন্তা থেকে এই আন্দোলন শুরু করেন গুরুসদয় দত্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও এই ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের দিক থেকে এই ব্রতচারী আন্দোলনের কোনো তুলনা হয় না। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি তার বক্তৃতায় এই ব্রতচারী আন্দোলনের কথা অনেকবার বলেছেন। ব্রতচারীর এই শিক্ষাকে বর্তমান শিক্ষা অভিযাত্রায় কাজে লাগানো হবে। আর এতে শিক্ষাটি যন্ত্রনির্ভরতা থেকে মুক্তি পেয়ে হয়ে উঠবে মানবিক।

বর্তমান বিশ্বে মানবিক শিক্ষা খুব বেশি করে প্রয়োজন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত যে সমন্বিত শিক্ষার কথা বর্তমান শিক্ষা অভিযাত্রায় বলা হয়েছে তা খুবই সঙ্গত। এভাবে শিক্ষা সম্প্রচার করা গেলে ছাত্রছাত্রীরা একটি সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যন্ত অগ্রসর হবে। এর পর তারা ইচ্ছেমতো বিভাগ গ্রহণ করতে পারবে। তাদের আগ্রহ ও পছন্দটি এই সময়ে হয়ে ওঠার কথা। অষ্টম শ্রেণিতে এটি আসলে হওয়ার কথা ছিল না। তার পরও আগে অষ্টম শ্রেণির পরই তাদের বিভাগ নির্বাচন করতে হতো। এবার যথার্থভাবেই তাতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। দশম শ্রেণির পর তারা তাদের বিভাগ নির্বাচন করবে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এভাবেই বিভাগ নির্বাচনের রীতি রয়েছে। আগে নবম শ্রেণিতে বিভাগ নির্বাচন করার কারণে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ছাত্রছাত্রীরা যেমন মৌলিক মানবিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো ঠিক, তেমনি মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ও বঞ্চিত হতো মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে। অথচ জীবন পরিচালনা করতে এই মানবিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দুটোরই প্রয়োজন। এবার পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্যায়নভিত্তিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোট কথা বর্তমান পরিবর্তিত শিক্ষা নিয়মে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্ম উপযোগী শিক্ষিত মানবগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্য পরিদৃষ্ট হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার পর আমরা যে বাংলাদেশ পাব তা হবে কর্মসংশ্লিষ্ট শিক্ষিত বাঙালির বাংলাদেশ, কর্মহীন বেকার বাঙালির বাংলাদেশ নয়।

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর : প্রাবন্ধিক ও উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ